মন্থন সাময়িকীর পাঠক সভা

৪ নভেম্বর, বিকেল ৪টে

ঠিকানা – শামিল ছোটদের পাঠশালা,
৩/১০২ চিত্তরঞ্জন কলনি, বাঘাযতীন

যোগাযোগ : জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)

Vol 4 Issue 8 16 October 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ১৬ অক্টোবর ২০১২ মঙ্গলবার ২ টাকা

• ডি–ভোটার পৃ ২ • চলতে চলতে পৃ ২ • মেলামেশা পৃ ২ • সাপুড়ে পৃ ৩ • থ্যালাসেমিয়া পৃ ৩ • মালালা পৃ ৪ • মন্দির পৃ ৪ • গুরুদাস পাল পৃ ৪

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে

ভোরবেলা সাগরে ভাসছে জেলেদের নৌকা, পুরী, অক্টোবর ১২, ছবি জীতেন নন্দীর তোলা

ফলতা সেজ–এ কোহিনুর পেপার–মিলের কিসসা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৫ অক্টোবর •

ফলতা সেজের ৪নং সেক্টর পেরিয়ে গেলে শুরু হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার। এর সামনের রাস্তা ধরে নীলার দিকে যে রাস্তা এগিয়েছে তার কাছে যেখানে ঝিঙের পোল (একটি কালভার্টের নাম, তলা দিয়ে নদী থেকে সোঁদা খাল ঢুকেছে, এখানে রাস্তার যেদিকে নদীর সাইড সেই অংশে প্রচুর ঝিঙে চাষ হয়, তা আমতলা মার্কেটের পাইকাররা কিনে সারা রাজ্যে বিক্রি হয়। তাই এই নাম) তার একটু আগে যে বিরাট কারখানাটা রয়েছে ওটার নাম কোহিনুর পেপার মিল।

২০০৯ নাগাদ এই পেপার মিলটা চালু হয়। একেবারে প্রথম দিকে সেটা আগস্ট হবে, তখন ৪ জন শ্রমিক মাল লোড–আনলোড করার কাজ করত। এই সময় রোজ ছিল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। তখনও পুরোদমে কাজ শুরু হয়নি। ২০১০ এর মার্চ–এপ্রিল নাগাদ কাগজ সর্টিং আর পাল্পার পদের জন্য লোক নেওয়া হয়, তা প্রায় ৩৭ জন। এর পর নভেম্বর নাগাদ এটা বেড়ে প্রায় ৮০ জন লোক দাঁড়ায়। তখন কারখানায় চারটে কন্ট্রাকটার (টুসু, জাকির, কমল, রবীন) কাজ করত। এদের মধ্যে টুসু বাদে বাকিরা স্থানীয় হওয়াতে তাদের জোর ছিল বেশি। তাই ৭৫ টাকা রোজে কাজ করাতো আর টুসুই একমাত্র ৮০ টাকা রোজ দিত। কেউই পিএফ, ইএসআই–এর বালাই রাখেনি। টুসুর কাছে যারা কাজ করত, তাদের ইএসআই–এর কার্ড হয় ২০১১–র নভেম্বর মাসে। আর সবার কাছে এইসব ফেসিলিটির কথা জানতে চাইলে জবাব দেওয়া হত ২০১২–তে স্মার্ট কার্ড হবে তাতে করে জোকা ইএসআই অফিসে পুরো ফ্যামিলির চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে। ২০১০–এর মার্চ নাগাদ দীপক হালদার নামে এক শ্রমিক সকালের কাজ করে বাড়ি ফেরার পর আবার তাকে কাজ করার জন্য কোম্পানি ডাকে, রাতের শিফটে কাজে যেতে। সেই লেবারটি কাজে যায়। কিন্তু ক্লান্তিজনিত কারণে পেপার পাল্পের যে প্রেসিং মেসিন তাতে তার দুটি হাত ঢুকে যায়, কাঁধ থেকে ছেড়ে যায়, তিনি মারা যান। প্রথমে সুপারভাইজাররা চেয়েছিল বডি বয়লারে দিয়ে লোপাট করতে। কিন্তু লেবারদের চাপে তা পারেনি। যদিও একটা হাত কাগজের গাদায় লুকিয়ে ফেলে। পুলিশ এসে শ্রমিকদের চাপে তা উদ্ধার করে। এরপরে শ্রমিকদের প্রেসারে ৪০,০০০ টাকা (দাহকাজের জন্য) আর ৮লাখ টাকা (ক্ষতিপূরণ) দেবে বলে রাজি হলেও শেষে ২০,০০০ ও ৪ লক্ষ টাকা দেয়। আর তার বউকে তাদের ক্যান্টিনে একটা কাজ দিয়েছে অনেক টালবাহানার পর।

দিলীপ মণ্ডল এখানকার এক ইউনিয়ন লিডার। তিনি গোড়া থেকেই প্রতিদিন ২ টাকা জনপ্রতি ফান্ডের নামে চাঁদা তুলতেন। এমনকী এও নাকি কানাঘুষো শোনা যায়, যারা সরিষা, শিবানীপুর অঞ্চলের থেকে কাজ করতে আসে তাদের কাছ থেকে ৫০০০–১০,০০০ টাকাও নেওয়া হয়েছে। যারা কখনো এসব নিয়ে বলেছে, প্রতিবাদ করেছে, মাইনে বাড়ানোর কথা বলেছে তাদের গেটপাস কেড়ে নিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই ৮০/৯০ জনকে বাদ দেওয়া হয়। এজন্য বটি তোলার জন্য যেমন জমিদারদের আগে লোক থাকত তেমন এদেরও লোক থাকত। তাকে কিছু পাওয়ারও দিয়েছিল। যদিও ওকে টাকা দিত কেবল পেট চালানোর মতো হাজার দুয়েক টাকা। ২০১০–এ একবার পুজোর আগে বোনাস দিতে হবে এই দাবিতে লেবাররা আন্দোলন শুরু করে। শোনা কথা, এই দিলীপ মণ্ডল মালিকপক্ষের সাথে কারসাজি করে বোনাস হিসাবে একটা জামার পিস (ছেলেদের) আর শাড়ি (মেয়েদের) রফা করে।

এরপর তিন–এর পাতায়

কোলাঘাটের ইলিশ আর নেই

২৬ সেপ্টেম্বর, কামরুজ্জামান খান, মেছেদা •

কোলাঘাট শহরটি রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরটি ব্রিটিশ আমলে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্দর–কেন্দ্রিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল এখানে। মূলত পাট, কয়লা, কাঠ ব্যবসার জন্য ছোটো ছোটো জাহাজ আসত কোলাঘাটে। আর কোলাঘাটের ইলিশ তো জগদ্বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে, রেলের ব্রিটিশ বাবুদের একটা করে ইলিশ উপহার দিয়ে অনেকে রেলের বিভিন্ন কাজে চাকরি পেয়েছিল। যদিও রেলের বেতন ছিল যৎসামান্য। বিভিন্ন কাজে উপঢৌকন হিসেবে কোলাঘাটের ইলিশের প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে কোলাঘাটের ইলিশের চাহিদা অনেক গুণ বেড়ে যায়। রূপনারায়ণ নদে তখন হাজার হাজার ইলিশ মাছের আনাগোনা।, জেলেদের রমরমা বাজার। তখন এক একটা ইলিশ মাছ গোটা অর্থাৎ থবকা দরে বিক্রি হত। এক একটা মাছের দাম পড়ত দুই আনা থেকে আট আনা পর্যন্ত অর্থাৎ এখনকার ১২ থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত। রূপনারায়ণ নদের সেই বিখ্যাত ইলিশ ট্রেনে বুক করে পুরী, নাগপুর প্রভৃতি দূর দূর স্থানে পাঠানো হত। উড়িষ্যার চিলকার ইলিশের স্বাদ কোলাঘাটের ইলিশের তুলনায় কিছুই ছিল না।

একসময় কোলাঘাট থেকে পূর্বে তমলুক এবং পশ্চিমে রানিচক (ঘাটাল) পর্যন্ত স্টিমার চলত। ক্রমশ রূপনারায়ণ মজতে থাকে। তার চড়ায় স্টিমার আটকে যেত, আবার জোয়ার এলে সেই স্টিমার ভেসে উঠে যথাস্থানে পৌঁছে যেত। আজ এই স্টিমার চলাচল নেই। নদীর বুকে পলি ভর্তি হয়ে চরা পড়ে যাওয়ায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে স্টিমার বন্ধ হয়ে যায়। ইলিশ মাছের আনাগোনাও নেই বললেই চলে, কোলাঘাটে ইলিশ মাছ আর ধরা পড়ে না বললেই চলে।

কিন্তু মানুষের মনে ইলিশের সেই স্বাদ আর গন্ধের অনুভূতি রয়ে গেছে। তাই আজও বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে চারচাকা গাড়িতে চেপে বাবু ক্রেতারা ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশের খোঁজে কোলাঘাটে আসে। এক–দুই হাজার টাকা পকেট থেকে বের করে দিয়ে এক–দু কেজি সাইজের ইলিশ কিনে নিয়ে মহানন্দে তারা বাড়ি ফিরে যায়। অথচ তারা জানে না যে কোলাঘাটের ইলিশ ওগুলো নয়। কিছু অসাধু মাছ ব্যবসায়ী ভালো সাইজের ইলিশ মাছ ক্রয় করে সুন্দরভাবে প্যাকিং করে রাখে, খদ্দের দেখলে অতি যত্ন সহকারে মাছটিকে গছিয়ে দেয় শাঁসালো খদ্দেরের হাতে। আসলে এই মাছগুলো আসে ডায়মন্ড হারবার থেকে, কখনো খেজুরি বা হলদিয়ার মোহনা থেকে, আবার দীঘার মোহনা বা উড়িষ্যার তালসারি থেকেও আসে। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের ইলিশ সারা মরসুমে একটি বা দুটি কখনো–সখনো ধরা পড়ে জেলেদের জালে।

নদী মজে যাওয়া ছাড়াও কোলাঘাটে ইলিশ না আসার কারণ রয়েছে। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু হয় প্রায় বত্রিশ বছর আগে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষিত বর্জ্য অর্থাৎ দূষিত জল ও ছাই অনবরত এসে মিশছে রূপনারায়ণের জলে। এছাড়া রূপনারায়ণের ওপর রয়েছে চারটি ব্রিজ, ফলে ইলিশেরা আর কোলাঘাটমুখী হয় না। আর একটা কারণ হল, রূপনারায়ণ নদীর খাঁড়িমুখে জেলেরা সবসময় জাল ফেলে মাছ ধরে নেওয়ার জন্য মাছ আর উজান বেয়ে কোলাঘাটে আসতে পারে না।

কোলাঘাটের ইলিশ আজ রূপকথার গল্প। কোলাঘাটের ইলিশ মানেই সোনালি আঁশ, ঝকঝকে শরীর। একদম জ্যান্ত ইলিশ সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে, আলতো হাতের ছোঁয়ায় হড় হড় করে পিছলে যায়। যখন কড়াইয়ে চাপানো হয়, রান্নাঘরের বাইরে পাড়াজুড়ে ম ম করতে থাকে তার পাগল করা গন্ধ। কোলাঘাট আছে, রূপনারায়ণও বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে। কিন্তু সেই ইলিশ আর নেই।

হাওড়া জেলার বালি–ঘোষপাড়া অঞ্চলে জলাভূমির ওপর প্রোমোটরের শ্যেনদৃষ্টি

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৫ অক্টোবর •

১০ কাঠার বেশ বড়োসড়ো জলাভূমিটি বোধহয় আর থাকবে না। তার কারণ একটাই, জলাভূমিটির মালিক স্নেহলতা পালের সাথে এক প্রোমোটরের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আপাতত জলের মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়ে আংশিক ভরাট করে বাড়ি তোলা হবে। এরপর পুরো জলাভূমিটি হারিয়ে যাবে। জায়গাটা হল হাওড়া জেলার বালি ষ্টেশন থেকে দশ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে বালি গ্রাম পঞ্চায়তের অধীন উত্তর ঘোষপাড়া। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই। অথচ জলাভূমি রক্ষার আইনে পরিষ্কার বলা আছে, এই ব্যাপারে পঞ্চায়েতের ভূমিকাই চূড়ান্ত। Forum For Citizen Rights- এর কর্মীরা জলাভূমিটি বাঁচাবার জন্য ছুটোছুটি করছে, বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠাচ্ছে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির সাথে যোগাযোগ করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তপন দত্ত ২০০০ বিঘার জলাভূমি বাঁচাতে গিয়ে কর্পোরেট হাউসের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত এই জলাভূমিটি বাঁচানো যাবে কিনা তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

লেকটাউন পাতিপুকুর এলাকায় বিশাল জলাশয় বোজানো হচ্ছে ধীরে ধীরে, হেলদোল নেই স্থানীয় নাগরিক ও জনপ্রতিনিধিদের

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন,১৫ অক্টোবর •

সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ৩১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পাতিপুকুর ১ নম্বর পল্লিশ্রী কলোনি প্রায় বিঘা দুইয়ের বেশি একটি বড়ো জলাশয় বুজতে বসেছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুরকর্তাদের অবহেলায়। দীর্ঘদিন ধরেই পুকুরের পাশে বসবাসকারী বাসিন্দারা একটু একটু করে পুকুরের জমি দখল করে নিয়ে চলেছে। এখন এই অঞ্চলে ফ্ল্যাটের রমরমা কারণে পুকুর ধারে যেসব বাড়ি এখন ফ্ল্যাট হচ্ছে তার রাবিশ ফেলা হচ্ছে পুকুরে। কলকাতার উপকণ্ঠে সকলের গোচরেই চলছে এই কাণ্ড। আশেপাশের বাসিন্দারা ফেলে চলেছে ময়লা অনবরত। বর্তমান কলোনি সেক্রেটারি সুশীল নাগ, কাউন্সিলার পলাশ দাশ এবং স্থানীয় বিধায়ক সুজিত বোস প্রত্যেকেই এই জলাশয়টির সংরক্ষণের প্রতি যে বিমুখ তা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা এই জলাশয়টির অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। আমরা এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে আবেদন রাখছি যথাযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য। সাথে সাথে স্থানীয় নাগরিকদেরকেও সচেতন হয়ে এই জলাশয়টিকে সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্পাদকের কথা

কেজো লোকের পুজো

দুর্গাপুজো আমাদের চারপাশের সবচেয়ে জাঁক করা উৎসব, সন্দেহ নেই। এর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় আর সব উৎসব, রান্নাপূজো থেকে ঈদ, অথচ এই উৎসবটির আশেপাশেই হয় সেগুলো। দুর্গাপুজো তো চিরকালই বারোয়ারি, কিন্তু ঢাকা পড়ে যাওয়া উৎসবগুলি বাড়ি বাড়ি চলে। আয়োজন নিজস্ব। নিজেদের ব্যাপার। তাই আমাদের মনেও দুর্গাপুজোই পুজো। আমাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে যে মেয়ে, সে আজ কয়েক মাস হল বলে যাচ্ছে, শাড়ি বা টাকা না দিয়ে পুজোতে মোবাইল সেট দেওয়ার কথা। পুজোতে কী পাওয়া যাবে বাবু-বাড়ি থেকে, কী পাওয়া যেতে পারে, তা ঠিকে কাজ করা মেয়েদের আলোচনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে। শহরে দোকানে বাজারে যারা কাজ করে, পুরসভার ময়লার গাড়ি বা গ্যাসের যোগান দেয় যারা, তাদের চিন্তা বকশিস। খদ্দেরদের কাছ থেকে। আর মালিকের কাছ থেকে বোনাস।

আমি যে দোকান থেকে মুদির বাজার করি, সে পুজোর সময় একটা তেলেভাজার দোকান দেবে তার মুদিখানার দোকানের সামনে। শুধু সে নয়, অনেকেই পুজোর সময় পসরা সাজিয়ে বসবে, রাস্তার দু-ধারে। তাদের কারো ছোটো দোকান আছে, কেউ হকার। কারখানায় কারখানায় আসবে পুজোর বোনাস, নিদেনপক্ষে অ্যাডভান্স।

এরা তো কাজ করে। আর এক ধরনের লোকও আছে, যারা চাকরি করে। তাদের কাছে পুজো মানে ক-দিনের ছুটি। দুর্গাপুজো নামের জাঁকজমকওয়ালা বারোয়ারি উৎসব কেজো লোকের কাছে গুছিয়ে নেওয়ার মওকা। খুব বেশি হলে একটু দেখতে বেরোনো। না বেরিয়ে টিভিতেও দেখে নেওয়া যায়। মোবাইলে 'হ্যাপি পুজো' বলে দেওয়া। এ পুজো কোনোভাবেই তার নিজের নয়। যত দিন যাচ্ছে, তত তা দূরের হচ্ছে। জাঁকও বাড়ছে।

'মেলা-মেশা-৩' হয়ে গেল গত ১৩ ই অক্টোবর বিকেলে ২১/৫ অশ্বিনী দত্ত রোডে, 'স্বভাব'-এ। ছিল 'কবাড সে জুগার', নানা ফেলে দেওয়া অদরকারি জিনিসপত্র থেকে টুকিটাকি গেরস্থালির জিনিসপত্র তৈরি, পর্দার এক্সিবিশন, তেল ছাড়া রান্না, নানান মজাদার খেলা আর সে খেলায় খেলতে খেলতে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা, মহিরামপুর শিশুকাননের ছেলেদের নাটক 'ঈদের চাঁদ' (কেবলমাত্র তিন দিনের রিহার্সালে তৈরি) আর কুদানকুলামের আন্দোলনের সমর্থনে পোস্টার এক্সিবিশন। সমস্তটার মধ্যে সামগ্রিক চেষ্টা ছিল চালু 'দেওয়া-নেওয়া'র আর্থিক সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে একটি সবাই-এর যোগদানের সার্বিক ইচ্ছা।

'ডি-ভোটার'-এর ফাঁস থেকে মুক্তি কোন পথে?

বিজয়া করসোম, শিলচর, ১৪ অক্টোবর •

ডি-ভোটার। অসমবাসীর কাছে শব্দদুটি ভীষণ আতঙ্কের বিষয়। না, সারা ভারতে ডি-ভোটারের কোনো নজির নেই। আর এ নিয়ে যদি দিশপুরের বড়োকর্তাদের প্রশ্ন করেন, তখন শুনবেন, ডি-ভোটার চিহ্নিত করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। যেহেতু এটি একটি সাংবিধানিক কমিশন, তাই এর কাজে হস্তক্ষেপ বা নির্দেশ দেওয়া বিধিসম্মত নয় এবং তা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে। প্রায় এক বছর আগে সিআরপিসি (নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি)-র এক প্রতিনিধিদল দিল্লির নির্বাচন কমিশনের কাছে যায় এবং কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। সদস্যরা আকাশ থেকে পড়ে। তারা জানায়, তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। পরে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনাকালে একজন নিম্নবর্গের আধিকারিক জানান, কয়েকবছর আগে নির্বাচন কমিশন অসমে লক্ষাধিক নাগরিককে ডি-ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এ যাবৎ তারা ডি-ভোটার হিসেবে রয়ে গেছে। এর কোনো সুরাহা হয়নি এবং এই তালিকা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। ব্যস্। এই পর্যন্তই। তা, রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে থাকা একটি বিষয় সম্বন্ধে রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেন কেন? অসমের মুখ্যমন্ত্রী যখনই এই বক্তব্য রাখেন, তখনই বলেন, ভোটার তালিকায় যাদের নাম ডি-চিহ্নিত, তাদের বেশিরভাগই ভারতীয়। কী করে তিনি তা জানলেন? আর জানলেনই যদি, তবে কেন তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে মেনে নিয়ে সব নাগরিক অধিকার দেন না? তারা জমি কেনাবেচা, সরকারি চাকরি, ভোটাধিকার প্রয়োগ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে কীভাবে? তা-ও বছরের পর বছর?

এ রাজ্যের মানুষ যখন ডি-ভোটার ইস্যুতে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছে, আছড়ে পড়েছে কয়েকটি সংবাদ। ক) ২৮ সেপ্টেম্বর একটি খবরের শিরোনাম ছিল : অভিযুক্তের বক্তব্য না শুনেই রায় দিতে পারে ট্রাইবুনাল। সেখানে বিস্তারিতভাবে পাই, বিদেশির তকমা লাগানো সংখ্যালঘুদের আখেরে বিচারের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অসমের বিদেশি সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে গিয়ে 'অভিযুক্ত'দের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬৪ সালের 'ফরেনার্স (ট্রাইবুনাল) অর্ডার' সংশোধন করে কেন্দ্র বিদেশি ট্রাইবুনালকে অধিক ক্ষমতা দিয়েছে। যার ফলে অভিযুক্তের সাক্ষীর বক্তব্য না শুনেই রায় ঘোষণা করতে পারে ট্রাইবুনাল। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে সরকারের সাক্ষীকে 'এগজামিন' করার সুযোগও নাও দিতে পারেন ট্রাইবুনালের বিচারক। দেশের বিচার প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু বিচার দিলেই চলবে না, বিচার যে হয়েছে, তাও বোঝাতে হবে। কিন্তু ১৯৬৪ সালের 'ফরেনার্স (ট্রাইবুনাল) অর্ডার' সংশোধন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্ভবত তা মাথায় রাখেনি। তাই বিদেশি বলে কাউকে নোটিশ জারির পর সেই অভিযুক্তকে বিচার প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিই কার্যত তুলে দেওয়া হয়েছে। খ) সন্দেহজনক নাগরিককে ট্রাইবুনালের নোটিশ পাবার দশদিনের মধ্যে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সেই সন্দেহজনক বিদেশি ব্যক্তির বিচার একতরফাভাবে হবে ও তাকে বিদেশি চিহ্নিত করা হবে। গ) সন্দেহজনক ব্যক্তির প্রমাণ গ্রহণের বদলে পুলিশের দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেও ট্রাইবুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে বিদেশে ঠেলে দেওয়ার আদেশ জারি করতে পারেন।

প্রশ্ন হল, মাত্র দশদিনের মধ্যে জরুরি নথিপত্র দেওয়া সম্ভব? জীবন-জীবিকার টানে মানুষ আজ ক-ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। জরুরি নথিপত্র খোঁজ করা, জোগাড় করা, এসব নির্দিষ্ট কার্যালয়ে জমা দেওয়া চাট্টিখানি কথা? সম্ভব তা দ-শ দিনে করে ফেলা? আরও এক ভয়ঙ্কর কথা হল : পুলিশের দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেও যে কেউ বিদেশি হয়ে যেতে পারে। ভাবুন। কী মারাত্মক কথা!

খুব সম্ভবত গত বছরই বেরিয়েছিল মানিক দাসের ঘটনার বিবরণ। তিনি বলেছিলেন : 'এমন লাঞ্ছনা, অপমান, মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছি, তা বলার মতো নয়। বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে রেখে অজানা স্থানে ছিলাম ক-দিন। জোটেনি খাবারও। জনা কয়েক অসম পুলিশের বর্বরতা ও অমানবিক অত্যাচারে তখন দিশেহারা। এ ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। ... দীর্ঘ চার বছর আইনি লড়াইয়ের পর জয়ী হলাম মামলায়। কিন্তু গত চার বছর বাংলাদেশি তকমা দিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার যে সমস্ত ঘটনা, তা ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকবে আজীবন।' প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আদালতের চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়ে এই মন্তব্য করলেন বাহান্ন বছর বয়সি কলা ব্যবসায়ী মানিক দাস। ২০০৬ সালে বাংলাদেশি নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় মানিকের হাতে। স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যার নামেও একই নোটিশ। এ ব্যাপারে মানিক দাসের কাছ থেকে কোনো নথি সংগ্রহ করেনি পুলিশ।

২০১২ সালের জুন মাসের ঘটনা। দেশে জন্মেও বিদেশি নির্ধারণ ট্রাইবুনালের ফতোয়ায় গায়ে তকমা লেগেছিল 'বিদেশি' বলে। ট্রাইবুনালের একতরফা রায়ের পর চার বছর ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন তিনি। কাছাড় জেলার কাটিগাড়া থানার সুবোধনগর গ্রামের যুবক অর্জুন নমশূদ্র। আপিল মামলা যত এগোচ্ছিল, সুস্থ হচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সচিত্র ভোটার তালিকার জন্য নির্বাচন কর্তারা বাড়ির আঠারো ঊর্ধ সবার কাছ থেকে কাগজপত্র চেয়ে নিলেও অর্জুনের খোঁজ করেনি। কারণ? সর্বশেষ ভোটার তালিকায় তাকে ডাউটফুল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার আর সইতে পারেননি। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এই তরুণ। অর্জুনের মা আকলরানি নমশূদ্র ১৯৬৯ সালের কাগজপত্র দেখিয়ে প্রশ্ন রাখেন : যে ছেলে কোনোদিন বাংলাদেশে একবারের জন্যও গেল না, তাকে কী করে বাংলাদেশে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়? এ বিষয়ে আইনজীবী অনুপ চৌধুরির মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশি' সন্দেহে সমন জারি হলে অর্জুন ২০০৭ সালের ৩ মে যথারীতি আদালতে হাজির হন। কিন্তু পরবর্তী তারিখ আর জানতে পারেননি। ২০০৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি একতরফাভাবে তাঁকে বিদেশি বলে রায় দেন ফরেনার্স ট্রাইবুনালের সদস্য এ কে চৌধুরি। রায় পড়েই অর্জুন জানতে পারেন, নাগাড়ে অনুপস্থিত থাকার দরুন একতরফা রায় হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি (সিআরপিসি) সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ বলেন, 'অর্জুনকে আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে। ভারতে জন্মেও তাঁকে দেশে থাকতে না দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন। কাগজপত্র না দেখেই অর্জুনের নাম ফরেনার্স ট্রাইবুনালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গরিব মানুষ আইন আদালত বোঝে না বলে তাদের গায়ে অহেতুক 'বাংলাদেশি' তকমা এঁটে হয়রানি করা হচ্ছে'।

অর্জুন যদি জানতে পারতেন জীবনুদ্দিনের কথা? জানার কোনো সুযোগ অর্জুনের পাবার কথা নয়। কারণ জীবনুদ্দিনের কথা আমরাই জানতে পেরেছি গত মাসের ত্রিশ তারিখ। কী সেটা? খবরটা ওই দিনেই বেরিয়েছে : বিদেশি ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করা হয়েছিল। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারেও বহাল রাখা হয় সেই নির্দেশ। শেষ পর্যন্ত সেই 'বিদেশি' জীবনুদ্দিনই স্বদেশির মর্যাদা পেয়েছেন ট্রাইবুনালের পুনর্বিচারে। ... তাই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককেই যে 'বিদেশি' সাজিয়ে বহিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছিল বিদেশি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, জীবনুদ্দিন এর নতুন নজির।

কয়েকটি জরুরি তথ্য : ক) অসমে কয়েক লক্ষ ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ডি-ভোটার। খ) ১১ জুলাই ২০১১ অসমের বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে এ রাজ্যে ডি-ভোটারের সংখ্যা, ২,২১,৯৩৬। গ) বর্তমানে লক্ষাধিক মামলা আসামের ৩৬টি ফরেনার্স ট্রাইবুনালে বিচারাধীন। ঘ) ট্রাইবুনালের অধিকাংশেরই পরিকাঠামো নেই। বিচারপতিও নেই। অর্থাভাবে এগুলি ধুঁকছে। ঙ) প্রফুল্ল মহন্ত প্রচার করেছিলেন, অসমে ৩০-৪০-৫০ লক্ষের বেশি ডি-ভোটার আছে। সংখ্যাগুলি তাঁরই বিভিন্ন সময়ে দেওয়া। অথচ, দু-দুবার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি কয়েক হাজার মানুষকেও ডি-ভোটার চিহ্নিত করতে পারেননি। চ) রাজ্যপাল হিসেবে এস কে সিনহা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা অবাস্তব ও পক্ষপাতদুষ্ট।

উপসংহারে বলতে চাই, বরাক উপত্যকার প্রাবন্ধিক বিনোদলাল চক্রবর্তীর ভাষায় : 'আমরাও চাই না অসম বা ভারতের অন্যান্য স্থানে অবৈধ নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটুক। অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক। প্রকৃত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করা হোক। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা নির্ধারণে যেন নির্যাতিত ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হওয়া আশ্রয়প্রার্থীদের একচোখে দেখা না হয়। ... অসমে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিকত্ব নিয়ে পদে পদে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তার ইতি কবে হবে তা কেউ হলফ করে বলতে অসমর্থ। অসমের বাইরে অসমের বাঙালিদের বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে উগ্র অসমীয়াপন্থীদের প্রচার অনেকটাই সফল। ... অসমের বাইরে আমাদের অবস্থান ও সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের জোরদার প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। ...'

চলতে চলতে

জানো তো, ওই পাশ-বালিশটাই আমার মা

অমিতা নন্দী, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা, ১২ অক্টোবর •

ভবানীপুরের 'জগুবাজার' বাসস্টপে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ২৪১এ বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। একই সঙ্গে অপেক্ষা করছে আরও বেশ কিছু মানুষ। একজন বয়স্কা মহিলা এবং একটি কিশোর যার হাতে-কাঁধে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জামের দুটি বড়ো ব্যাগ — দুজনেই আমার মতো একই রুটের বাস ধরার অপেক্ষায়। সবাই কমবেশি অস্থির হয়ে উঠেছি। শুনলাম ওই মহিলা বিকেল পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ওদের জানালাম যে সকালে অফিসটাইমে যখন আমি আকড়া ফটক-রবীন্দ্রনগর থেকে ভবানীপুরে আসি, তখনও বাস অনেক বাদে বাদে আসছিল। কিছুদিন ধরেই বাস যে লক্ষণীয়ভাবে কম চলছে, এটা অনেকেই বুঝতে পারছে। কিশোর ছেলেটিকে বললাম, 'বাবা, এরপর যে বাসটি আসবে তাতে এত ভিড় হবে যে তুমি বোধহয় এসব ঢাউস ব্যাগ নিয়ে উঠতে পারবে না। তুমি তো বললে জিনজিরা বাজার যাবে। এক কাজ করো, কোনো ফাঁকা বাস পেলে টালিগঞ্জ (চারুমার্কেট) স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ব্রেসব্রিজ চলে যাও, ট্রেন তবু নির্দিষ্ট সময়ের কাছাকাছি পাবে'। ছেলেটি বলল, 'এখন অফিসফেরতা ভিড়ের ট্রেনে আমাকে উঠতেই দেবে না। আমি বরং হাজরা চলে যাই, ওখান থেকে আরও কোনো বাস পেতে পারি'। সেই মতো সামনে যে ২১/১ আসছিল, ও তড়িঘড়ি তাতেই উঠে পড়ল, আমি আর বলে উঠতে পারলাম না যে, তাহলে একেবারে তারাতলায় গিয়ে নেমো। আর অবাক কাণ্ড, ঠিক তার পরের বাসটিই এল ২৪১এ এবং বেশ হালকা ভিড়। আমি এবং ওই মহিলা তো হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম। উঠেই বাঁদিকে একটা সিটে ওঁকে বসিয়ে ড্রাইভারের কেবিনের পাশে একটু উঁচুতে আমিও বসার জায়গা পেলাম। তারপর দুজনেই আপশোষ করছি, আহা রে। ছেলেটাও এই বাসে অনায়াসে উঠতে পারত। কিন্তু আমরা তো কেউ গণৎকার নই, কী করে জানব তখনই ২৪১এ এসে পড়বে?

বাসটা যেই হাজরা মোড়ে এল, আমি জানলা দিয়ে বাসস্টপে ওই ছেলেটিকে আতিপাতি করে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম, হাত নাড়লাম। কিন্তু না, ততক্ষণে এত লোক উঠে পড়েছে যে ছেলেটি আর উঠতে পারল না। দেখলাম ও অটো ধরতে এগিয়ে গেল।

তারপরেই প্রচণ্ড চেঁচামেচি-কথা কাটাকাটির শব্দে বাসের ভিতর দৃষ্টি ফিরল। ড্রাইভারের কেবিনের কাছে ভিড়ের চাপে বেশ কসরৎ করে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে চাপ সামলাচ্ছেন। একটি বছর নয়-দশের বাচ্চাকে নিয়ে দুটি ব্যাগ সহ এক মহিলা উঠেই খুব চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছেন — আপনাদের কোনো আক্কেল নেই, বাচ্চাটাকে এগোতে দিন, সরে যান এখান থেকে ... ইত্যাদি বলেই চলেছেন, উচ্চস্বরে। সবাই মিলে কিন্তু বাচ্চাটাকে দুটো ব্যাগ সহ ড্রাইভারের ইঞ্জিনের ওপরের সিটে বসার ব্যবস্থা করে দিল। যে লোকটিকে ওই মহিলা বকাবকি করছিলেন, তিনিও আর কোনো জবাব না দিয়ে হাত লাগালেন বাচ্চাটির জন্য। তারপরেও তার মা চেঁচাচ্ছেন দেখে আমি একটু ধমক দিয়ে দিলাম। একটু পরেই তিনিও ভালো সিট পেয়ে বসলেন। ছেলে কিন্তু ওই গরম সিটেই বসে থাকল।

ছেলে? হ্যাঁ, ওর পরনের স্কার্ট ও গেঞ্জি এবং চুলের ছাঁট দেখে সবাই হাফপ্যান্ট পরা ছেলেই ভেবেছি। তারপরই বুঝলাম একটা বাচ্চা মেয়ে। সে কিন্তু দিব্যি হাসিমুখে গল্প জুড়ে দিয়েছে আমার সঙ্গিনী ওই বয়স্কা মহিলার সঙ্গে। আমি ভাবলাম বুঝি চেনাজানা আছে। তার স্কুলের গল্প, খেলার গল্প, দিদিমণিদের গল্প, দিদিমণিদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে হাতে বল লেগে চোট পাওয়া এবং তারপর তাঁদের আদর-ভালোবাসা-যত্নের গল্প ... সে কত কিছু। মুখে যেন তার খই ফুটছে। কোনো ক্লান্তি নেই, একটু দূর থেকে তার মা মাঝেমাঝে একটু চোখ পাকাচ্ছেন, এত ভিড়ে পাছে লোকে বিরক্ত হয় তাই ওকে একটু চুপ থাকতে বলছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মুখে ব্যথা করছে না তো? ও ঘাড় নেড়ে 'না' বলল। বললাম, তবে তুমি যত খুশি কথা বলো, আমাদের ভালোই লাগছে। ইতিমধ্যে দেখি আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশকিছু লোকও সাগ্রহে ওর গল্প শোনার চেষ্টা করছে। কিছু পরে আমার পাশের আসন খালি হতেই ওকে বসালাম। তারপর আমিও গল্প জুড়লাম ওর সঙ্গে। জানলাম ওর কথা।

মেয়েটি এখন ক্লাস ফোরে পড়ে, হরিদেবপুরের একটি মিশনারি স্কুলে। ক্লাস ওয়ান থেকেই ওখানকার হস্টেলে থাকে। সপ্তাহে একবার বাড়ি আসে মা বা বাবার সঙ্গে। আর কোনো ভাই-বোন নেই। এখন পুজোর ছুটি পড়ে গেল — সেই নভেম্বরের মাঝামাঝি স্কুল খুলবে। তাই খুব আনন্দ হচ্ছে ওর। প্রশ্ন করি, তোমার ওখানে কোনো বন্ধু নেই? ওখানে থাকতে ভালো লাগে?

— হ্যাঁ, অনেক বন্ধু আছে। সবাই খুব ভালো। খালি মায়ের জন্য কষ্ট হয় মাঝেমাঝে। জানো তো আমার দুটো মাথার বালিশ আর একটা পাশ-বালিশ আছে। মায়ের কথা মনে পড়লে ওই পাশ-বালিশটা জড়িয়ে ধরে শুই। ওটাই তখন আমার মা।

দূর থেকে ওর মা তখন মিটিমিটি হাসছেন, আর আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। পাশের মহিলা বললেন, 'এই মেয়েকে দূরে পাঠিয়ে মা কেমন করে থাকে? এত ছোটো বয়সে বাড়িতে রেখে কি কোনো ভালো স্কুলে পড়ানো যায় না? কে দেবে তার উত্তর?

তারপর সন্তোষপুর স্টেশন রোডে পাহাড়পুর ক্লাবের বাসস্টপ এল, ওদের নামতে হবে। সবাই মিলে হাতে হাতে ব্যাগপত্র সমেত ওদের নামতে সাহায্য করল। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, এই ড্রাইভারকাকু, কন্ডাক্টরকাকু সবাই আমাকে চেনে। তারপর সবাইকে টা-টা করে নেমে গেল, যতক্ষণ না বাস ছাড়ল আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে লাগল।

গণবিজ্ঞান আন্দোলন

হরিশচক গ্রামে সাপুড়েদের প্রতারণা ফাঁস হল

অলকেশ মণ্ডল, বাগনান, হাওড়া, ৪ অক্টোবর •

হুগলির খানাকুল থানার হরিশচক গ্রাম থেকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে। মুণ্ডেশ্বরী নদীর ধারে কোলেপাড়ায় গ্রামের লোক তিনজন সাপুড়েকে ধরে রেখেছিল। এই সাপুড়েরা ওই গ্রামে এর আগেও বারবার এসেছে। এরা বিভিন্ন লোকের বাড়ি থেকে সাপ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। বিনিময়ে এক–দুই–তিন এমনকী চারহাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এবারে ওইদিন ওরকমই সাপ উদ্ধার করতে এসে ওরা ছয়হাজার টাকা দাবি করে। কিছু সাপ ওরা উদ্ধার করে, যেগুলো কেউটে সাপ। গ্রামের মানুষের সন্দেহ হয়, সাপগুলো হয়তো ওখানে ছিল না, ওরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। সেই সাপগুলো ওখানে ছেড়ে দিয়ে উদ্ধারের অভিনয় করে টাকা হাতানোর চেষ্টা করছিল।

এইরকম পরিস্থিতিতে গ্রামের লোক আমাদের ডেকে পাঠায়। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বাগনান শাখার শুভেন্দুর (সে সাপ নিয়ে কাজ করে) কাছে গ্রামের লোক প্রথমে খবর দেয়। খবর পেয়ে আমরা দুজন মোটরসাইকেলে করে ওই গ্রামে যাই। আমাদের সংগ্রহে থাকা দু–চারটে বিষধর সাপ সঙ্গে নিয়ে যাই, যদি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। সাপুড়েদের গ্রামের মানুষ ধরে রেখেছিল আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, আমরা কখন পৌঁছাব। দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওখানে পৌঁছে আমরা দেখি প্রায় হাজার দুয়েক লোক জড়ো হয়েছে। সকলের সামনে প্রমাণ করতে হবে, সাপগুলো সদ্য ধরা হয়েছে না ওদের কাছে আগেই ছিল। যদি প্রমাণিত হয়, সাপগুলো ওদের কাছেই আগে ছিল, তাহলে লোকের এতই আক্রোশ যে ওদের পিটিয়ে মেরেও ফেলতে পারে। তেমন ধরনের কথাবার্তাও হচ্ছিল ওখানে। আমাদের তখন দুটো কাজ — এক, ওরা যদি প্রতারক হয়, ওদের প্রতারক প্রমাণ করা এবং দুই, গ্রামবাসীর আক্রোশ থেকে ওদের বাঁচানো।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপরে বালির চরায় ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়ো জায়গা আছে। সেই চরায় সাপগুলো ফেলে আমরা দেখতে শুরু করি। মানুষ চারপাশে দাঁড়িয়ে যায়। দেখা যায়, একটা সাপের দাঁত ভেঙে তার মুখ ওরা ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং দাঁতগুলো ভেঙেছে যাতে বোঝার অসুবিধা হয় যে সাপগুলো সদ্য ধরা না আগে ধরা। আমরা দাঁতগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি, রক্তের উৎস দাঁত ভাঙা থেকে নয়, চোয়ালের অন্য জায়গা ওরা কেটে দিয়েছে। লোকে যখন চ্যালেঞ্জ করেছে, তখন ওরা নিজেদের বাঁচাতে এই কাণ্ডটা করেছে। দ্বিতীয় সাপটির দাঁত আগে থেকেই ভাঙা। গ্রামের মানুষকে বলি, আমরা জানি ওরা প্রতারক, কিন্তু ওদের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। গ্রামের দু–তিনজন ছেলে, যারা বিষয়টাতে মাথা দিচ্ছিল, তাদের আলাদা করে ডেকে বোঝাই। ওরা সম্মত হয়, বলে, ঠিক আছে, যা ভুল আমরা করেছি হয়ে গেছে, এখন আমাদের চেতনা হল। সাপগুলোকে চিহ্নিত করা গেল। ওদের কাছে একটা ব্যাগে যে সামগ্রী ছিল, তাতে হাড়, শিকড়, নানারকম পুঁথি, কবচ, এমনকী মেটালিক সোডিয়াম — যেটা ম্যাজিসিয়ানরা ব্যবহার করে এবং যেটা জলে ফেললে আগুন জ্বলে ওঠে — উদ্ধার হয়। সব বাজেয়াপ্ত করে ওদের হাত দিয়েই সেগুলো জলে ফেলে দেওয়া হয়।

সাপুড়েদের মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, ষাটের কোঠায় বয়স হবে, নাম নিমাই পাল; আর একজন পঞ্চাশের ওপর বয়স, নাম শিশির মাল; তৃতীয়জন শিশির মালের ছেলে হাকিম মাল, ডাকনাম ফটিক, ২২–২৫ বছর বয়স। ওরা থরথর করে কাঁপছিল। আমাদের কাছে প্রার্থনা করে, আমাদের বাঁচান। আমরা বলি, আপনারা গ্রামের লোকের কাছে স্বীকার করুন। ওরা দেখে সত্য ফাঁস হয়ে গেছে। তাই ওরা স্বীকার করে নেয়, সাপ দুটো আমরা সঙ্গে করে এনেছিলাম। যাদের বাড়ি থেকে ওরা আগেও টাকা নিয়ে গেছে, এরকম দু–একজন এগিয়ে এসে ওদের একটু চড়–থাপ্পড় মারে। টাকা ফেরত দেওয়ার কথা হয়। আমরা বলি, আপনারা ওদের সঙ্গে আলোচনা করুন, ওদের বাড়িতে যান। সাপুড়েরা থাকে আরামবাগের পুড়শুরা গ্রামে।

যাই হোক, গ্রামের ছেলেদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তারা ওদের বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্ব পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। তবে সাপুড়েরা বলে গেছে, আগামীদিনে সাপের খবর হলে ওরা আসবে। আমরাও বলেছি, হাজার টাকা দাবি করা চলবে না। একদিনের মজুরি নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা আর থানা–পুলিসের রাস্তায় যাইনি। ওরা কথা দিয়েছে, আর প্রতারণা করবে না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আমাদের বাড়ি উল্টোদিকে। আমরা আর দেরি না করে ফিরে আসি।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে লড়াই

দিলীপ মণ্ডল, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা,৩ অক্টোবর •

আমার ছেলের নাম সৌমিত্র মণ্ডল। দেড় বছর বয়সে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। ওর মাথাটা বড়ো ছিল, হাঁটতে জানত না, খেতে চাইত না। আমাদের আঙ্কেল (প্রতিবেশী) ছোটাছুটি করে অনেক জায়গায় ওকে নিয়ে গেলেন। বেহালা ট্রামডিপোর ওখানে এক জায়গায় বলল, ওকে ব্লাড দিতে হবে। ওরাই বলল, তুমি মাড়োয়ারি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করো। সোসাইটি আমাদের মেম্বার হতে বলল। আমরা পাঁচ–ছয়শো টাকা দিয়েছিলাম। প্রথমে ব্লাড কিনেই দিয়েছিলাম। নিজেদের আত্মীয়স্বজন কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। পাড়ার ছেলেরা আমায় অনেক সাহায্য করেছে। প্রথমে আশুতোষ স্পোর্টিং দু–বছর ক্যাম্প (ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প) করেছে। একবার ২০ জন (রক্তদাতা), আর একবার ২২ জন হল। ওরা বন্ধ করে দিল। অনেককে বললে ব্লাডের কার্ড দেয়। রবীন্দ্রনগর স্কুলের পাশে চন্দনদার বাড়িতেও ক্যাম্প হয়েছিল। ওখানে ৩৫ জন হল। সেটা দশ বছর আগেকার কথা।

এরপর আমাদের ক্লাব হল। নেতাজি সুভাষ রিক্রিয়েশন ক্লাব। সেই ক্লাব থেকে ক্যাম্প হচ্ছে। এবছর (গত রবিবার) ৫০ জন ব্লাড দিয়েছে। গতবছরও ৫০ জন হয়েছিল। আরও বেশি হত, প্রচার হয়নি। আমার গাড়িটা (অটো) নেই। আজ তিনবছর বসে আছি। কাগজপত্র নিয়ে ঝামেলা চলছে, গাড়ির রুট পারমিট দিচ্ছে না সরকার। আমার পুরোনো গাড়িটা দিয়ে দিয়েছি একজনকে, কারবালা রোডে চালায়। আমি ঘুরে ঘুরে রঙের কাজ করি। তারাতলা রুটে যেদিন পাই অন্যের গাড়ি চালাই।

এখন ছেলের বয়স তেরো বছর। মাসে দুবার রক্ত দিতে হয়। গরমকালে ক্রাইসিস পড়ে। ওর বি–নেগেটিভ লাগে। এই যে ক্যাম্প হল, আমাকে সমস্ত কার্ড দেওয়া হবে। সেই কার্ড আর দুশো টাকা সোসাইটিকে দিলে ওরা রক্ত, ওষুধ, টিফিন সব বন্দোবস্ত করবে। ওরা বি–নেগেটিভ ব্লাড না পেলে তখন আমাদের ডোনার জোগাড় করতে বলে। তখন সবার কাছে যাই। এখানে কারো বি–নেগেটিভ নেই। সামনের বাড়িতে একজনের বি–নেগেটিভ আছে বটে, কিন্তু ওর ইউরিক অ্যাসিড আছে বলে ওর রক্ত চলবে না। আর একজন আছে, সে দেয় না। ঘোষপাড়ায় একজনের আছে, যতবার যাই, সে আসানসোলে কাজ করে, তাকে পাওয়া যায় না। গত রবিবার ক্যাম্পে যে ডাক্তারবাবু ছিলেন, ওঁর কাছ থেকে একবার বি–নেগেটিভ ব্লাড পেয়েছিলাম। এইভাবে চলছে।

ছেলেটা পড়াশুনো বেশি করে না। খেলাধুলো করে। সাইকেল চালায়। আমরা বেশি চাপ দিই না। আমাদের ডাক্তার বলে দিয়েছে, চাপ দেওয়া যাবে না। এই ছেলের ওপরে মেয়ে আছে আমার। সে কলেজে পড়েছে, এখন চাকরির চেষ্টা করছে। তবে বাড়িতে বি–নেগেটিভ ব্লাড কারো নেই।

রেশনে মাসে ১৪ কেজি করে খাদ্য চাই

পুরুলিয়া জেলা দপ্তরে আলোচনা, ছবি প্রতিবেদকের

৫ অক্টোবর, জিতেন নন্দী, পুরুলিয়া •

জাতীয় স্তরে সরকারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খিদের সূচক ২২.৯ থেকে বেড়ে ২৩.৭ হয়েছে, অর্থাৎ ভারতে অনাহারের জ্বালা বেড়েছে। এদিকে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সরকারি গুদামে মজুত আছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ফুড সিকিউরিটি বিল আনছে আর বিপিএল–এর সংখ্যা বাড়াতে চাইছে। এমতাবস্থায় আমরা এপিএল–বিপিএলের ভাগাভাগি তুলে দিতে বলছি। কারণ প্রচুর গরিব লোক এতে বাদ যাচ্ছে। সার্বজনীন খাদ্যের অধিকার মেনে মাথাপিছু মাসে ১৪ কেজি করে খাদ্যশস্য (চাল, ডাল, গম ও ভোজ্যতেল সহ) বরাদ্দ ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

আজ ৫ অক্টোবর দুপুর বারোটার সময় পুরুলিয়া শহরে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জেলা নিয়ন্ত্রক শ্রী সাধন কুমার পাঠকের কাছে এই বক্তব্য পেশ করা হয় সমাজকর্মী মেহের ইঞ্জিনিয়ার এবং পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির কর্মীদের পক্ষ থেকে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে এ নিয়ে বিশদ আলাপ–আলোচনা করা হয়।

শহিদ হাসপাতাল স্থাপনের স্মৃতি

জ্যোতির্ময় সমাজদার এবং পুণ্যব্রত গুণ, শঙ্কর গুহনিয়োগীর সাথে ছত্তিশগড়ের দল্লি রাজাহারার শহীদ স্মৃতি হাসপাতালের সামনে, ১৯৮৭ সালের জুন মাসে। ছবি পুণ্যব্রত গুণের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে।

৯ অক্টোবর, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা •

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার আয়োজনে ডা. পার্থসারথী গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা দিলেন এবার ডা. আশিস কুণ্ডু। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল ছত্তিশগড়ের দল্লি রাজহারায় শংকর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে এবং খনি-শ্রমিকদের উদ্যোগে শহিদ হাসপাতাল স্থাপন (১৯৮৪)। ডা. কুণ্ডু ছাত্রজীবন শেষ করেই শংকর গুহ নিয়োগীর শ্রমিক আন্দোলনের কথা শুনে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। নিয়োগীজী তাঁকে একটা টিলা দেখিয়ে বলেন, সেখানে তিনি একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে চান। আশিস কুণ্ডু প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হল — সেই ঘটনা, শ্রমিকদের বেতনের টাকায় কীভাবে একটা হাসপাতাল তৈরি হল — সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন তাঁর বন্ধু ডা. শৈবাল জানা, ডা. পুণ্যব্রত গুণ এবং ডা. চঞ্চলা সমাজদারের ভূমিকার কথা। হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা পর্বে এঁরা সকলেই ছিলেন। ডা. কুণ্ডুর বক্তৃতার ভাষা ছিল অত্যন্ত সংযত; কিন্তু তাঁর আবেগ আমরা শ্রোতারা অনুভব করতে পারি। আমরা যারা নিয়োগীজীকে দেখেছি, শহিদ হাসপাতালেও গেছি, আমাদের কাছে ডা. আশিস কুণ্ডুর এই বক্তৃতা শোনা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

'সুচেতনা' পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

সঞ্জয় ঘোষ, সূর্যপুর, ১৪ অক্টোবর •

আজ সূর্যপুর শুভক্ষণ কমপ্লেক্স ভবনের সভাঘরে 'সুচেতনা' পত্রিকার ষোড়শ বর্ষের শারদ সংখ্যাটি 'সুন্দরবন দক্ষিণ চবিশ পরগনার ঐতিহ্যময় প্রত্নসংগ্রহশালা' বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ লেখক ও প্রত্নঅনুসন্ধানী সন্তোষ বর্মন। প্রধান অতিথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। মিউজিওলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অতুল ভৌমিক বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জেলার বিশিষ্ট প্রত্ন গবেষক, সংগ্রাহক ও প্রত্নপ্রেমীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দশগুণ বেশি মাইনে, আহমেদাবাদ চলল সুভাষ

অন্যদের বয়স বিশের কোঠায়। তারা সারাক্ষণই কিছু না কিছু করে চলেছে। মোবাইলে গান শোনা অথবা 'যাত্রা' শোনা, গল্প গুজব। এমনকী টয়লেটে ঢুকে মাঝে সাঝে কিছু নেশার জিনিস টেনে আসা। আপার বার্থে উঠে গিয়ে তাসের আসর বসানো ...। সুভাষ জানার বয়স একটু বেশি। তার অবশ্য মনমরা ভাব। বেহালার সখেরবাজারে এক গ্রিলের দোকানে কাজ করত সে। পেত দিনে দেড়শো টাকা মজুরি। এখন সে চলেছে আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদ থেকে আরও একঘন্টা বাসে গিয়ে এক কারখানায় কাজ। কী কাজ, তাও সে ভালো করে জানে না। শুনেছে, চড়া রোদের মধ্যে 'কেবল' পাততে হবে। মজুরি কিন্তু অনেক বেশি। ডেইলি হাজার পঞ্চাশ (এক হাজার পঞ্চাশ টাকা)। থাকা খাওয়া বাদে।

কথা বলতে বলতেই ফোন এল। বাড়ি থেকে, বউয়ের। দু–এক কথা বলে, তারপর ছেলেকে চাইল সুভাষ। ছেলেকে জিজ্ঞেস করল ফোনে, স্কুলে গিয়ে দুষ্টুমি করোনি তো? তারপর বউয়ের সঙ্গে আর দু–একটা কথা বলে ফোন রেখে দিল। দু–চোখের কোলটা একটু মুছে নিয়ে জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকল। আমি ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন পর ছুটি পাবেন, কিছু জানেন? বলল, আট মাস। তারপর বলল, ট্রেনে ঘুম এসে যায়। বলে, একটু পরেই বসে বসে ঝিমোতে লাগল সুভাষ।

গোটা হাওড়া আহমেদাবাদ এক্সপ্রেসে দেড়শো জনের টিকিট রিজার্ভেশন কাটা হয়েছে লেবার হিসেবে ওই কাজে যোগ দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোম্পানিই সব ব্যবস্থা করেছে, বলেছিল সুভাষ। বেশিরভাগই পুরোনো, আগে থেকেই ওখানে কাজ করে। সে নতুন, আর দু–একজন আছে, কিন্তু তারা আছে অন্য কম্পার্টমেন্টে। তার বউ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেয়ে। বউয়ের চেনা সূত্রেই এই দলে ভিড়ে যাওয়া। তাই সুভাষকে সবাই ডাকছিল — জামাই।

ট্রেনে সহযাত্রীর কথা ও ছবি, শমীক সরকার, ৩ অক্টোবর।

'রূপান্তর' পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

সঞ্জয় ঘোষ, বিদ্যাধরপুর, ১৫ অক্টোবর •

ভাবনাচিন্তাহীন নগরায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ এবং বিদেশি সংস্কৃতির তীব্র স্রোতের ধাক্কায় ভেসে চলা আমাদের দেশের তথাকথিত ভদ্রসমাজ যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিজের দেশের সংস্কৃতির শক্তপোক্ত শিকড়টিকে আঁকড়ে ধরার বদলে অন্ধের মতো একটি ভেসে চলা বিষাক্ত সাপকে আঁকড়ে ধরছে। ফলে নয় সাপের ছোবলে অথবা জলে ডুবে মৃত্যু অনিবার্য।

এই অবস্থায় মাটির অনেক গভীরে শিকড় চাড়িয়ে দেওয়া দেশজ সংস্কৃতির মূলটিকে চিনে নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরাই বাঁচার একমাত্র পথ।

শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার সোনারপুরের পরের স্টেশন বিদ্যাধরপুর থেকে প্রকাশিত রূপান্তর পত্রিকার অষ্টম বর্ষ শারদ সংখ্যাটি ওপরের মর্মের চিন্তা থেকেই 'লোকসংস্কৃতি ভাবনা' সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, পীর গাজি, লুপ্তপ্রায় বাদাই গান, লোককথা, লোকক্রীড়া, বঞ্চিত ছাত্রসমাজের হাল, প্রভৃতি বিষয়ে তেরোটি প্রবন্ধে সমৃদ্ধ সংখ্যাটি। সম্পাদক শম্ভুনাথ মণ্ডল। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২, ১৪ ডিসেম্বর — ১৯৮৭, ২২ নভেম্বর)–কে স্মরণ করা হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর বিদ্যাধরপুর স্টেশনের নিকটে একটি ভবনে অনুষ্ঠিত বর্তমান সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি ওয়াজেদ আলি। সভায় প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়। স্মৃতিচারণ করে কবি ওয়াজেদ আলি আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত অবস্থায় মুস্তাফা সিরাজকে তথাকথিত বিখ্যাত সাহিত্যিকদের জাত ধর্ম তুলে বিদ্রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সমাজে চলে আসা জাতি ধর্ম বিদ্বেষের অসুখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক শোভন বসু প্রশ্ন তোলেন, বর্তমান সাহিত্যে বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতিফলন নেই কেন? কুমারেশ নস্কর প্রসেনিয়াম নাটককে দর্শক না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম নাটক অর্থাৎ লোকনাট্যের জনপ্রিয় আঙ্গিক গ্রহণ করে নাটককে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান রাখেন। মৃন্ময় চক্রবর্তীর প্রতিবাদী ছড়া ছাড়াও আবৃত্তি, গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অংশ ছিল।

প্রথম পাতার পর

ফলতা সেজের পেপার মিলের কিসসা

আর এটা আবার শ্রমিকদের মেনে নিতে বলে, যখন কিনা শ্রমিকরা কারখানা গেটের ভিতরেই বোনাসের দাবিতে ধরনা দিচ্ছে। শ্রমিকরা এই রফা মানতে রাজি না হলে পুলিশ দিয়ে তাদের পেটানোও হয়। তারপরে ২০১১–তে অবশ্য ৫০০ টাকা বোনাস দেওয়া হয়। ২০১২–র মার্চ–এপ্রিলে কিছু লেবারের সাথে দিলীপ মণ্ডলের ঝামেলা শুরু হয় রোজ বাড়ানো, ফান্ডের হিসাব দাবি করে। এরা আলাদা করে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের দাবিও তোলে।

এপ্রিলের ১৪ তারিখে সকালের শিফটের শ্রমিকরা প্রতি মাসে মাইনে খুব দেরি করে দেওয়ার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেয়। ১৫ তারিখে যে লেবাররা আগে দিলীপ মণ্ডলের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে ছিল তারা কাজে যায় (১৪ তারিখে তারা নাইট করে সকালে বাড়িতে ছিল)। তখন সিকিউরিটি বলে, তাদের ঢুকতে দিতে মানা আছে। আর ঢুকতে দেয়নি। এভাবে ২২ জনকে আটকায়। এদের বাদ দেয়।

গত ১ অক্টোবর লেবার কমিশনারের কাছে মিটিং থাকলে সেখানে কোম্পানির এক ম্যানেজার সোনিজী বলেন — আমাকে মেরে ফেললেও এদের নেব না। লেবার কমিশনার তিনমাসের বেতন দিতে অনুরোধ করলেও, কেবল ১৫ দিনের বেতন দিতে রাজি হন। শ্রমিকরা তার বদলে ৫ মাসের মাইনে সাথে ৩ মাসের অ্যাডভান্স চায়। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অফিসে মিটিং থাকলেও সেখান এই ২২ জনের সাথে কিছু পৃষ্ঠপোষক যেতে চাইলে টিএমসি–র ছেলেরা সেখানে বাধা দেয়, ঢুকতে দেয় না।

খবর দিন খবর নিন

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 8 16 October 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

মুলুটি — একটি মন্দিরময় না-দেখা গ্রাম

দীপংকর সরকার, হালতু, ১৯ সেপ্টেম্বর •

কলকাতা থেকে ২২৫ কিমি দূরে রামপুরহাট, রামপুরহাট থেকে ১৫ কিমি দূরে সুরুচিয়া মোড়। বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা। ট্রেকারে করে আসা যায়। যে রাস্তায় রামপুরহাট থেকে বিহারের দুমকা বাসে যাওয়া যায়। সুরুচিয়া মোড় থেকেই হিন্দি সাইনবোর্ডের ছড়াছড়ি। এই মোড় থেকে বাঁদিকে ১০ কিমি দূরে এক আদিবাসী জনপদ এলাকা মুলুটি গ্রাম। শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশ। পূর্বে নাম ছিল মল্লহাটি। যোগাযোগহীন ও লোকচক্ষুর অন্তরালে, বহুদূরে। সুরুচিয়া মোড় থেকে মুলুটি আসতে গেলে কোনো গরুর গাড়ি, সাইকেল ভ্যান, অটো, ট্রেকার বা বাস পাওয়া যায় না। মুলুটি আসতে গেলে স্টেশন থেকে গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয়। গণদেবতা এক্সপ্রেসে রামপুরহাট গিয়ে সুরুচিয়া মোড় পর্যন্ত ট্রেকারে যাওয়ার পর আর কোনো যোগাযোগের মাধ্যম নেই। মুলুটি যেতে গেলে তাই অনেকেই গাড়ি ভাড়া করে স্টেশন থেকে। আমি সুরুচিয়া মোড় থেকে বাঁদিক ধরে কেবল এগিয়ে চলেছি। চারিদিকে শুধু ধুধু প্রান্তর। দূরে একটি সরু পাকা রাস্তা দেখা যায়। এই স্থানে বহু বছর আগে এয়ারপোর্ট এলাকা ছিল। অনেকক্ষণ হাঁটার পর প্রধান সড়ক রাস্তায় উঠলাম। এক হোটেল মালিকের সাথে দেখা হল। তিনি মুলুটি গ্রামে থাকেন। তাঁর সাহায্যে এক বাইক আরোহীর পিছনে বসে পৌঁছে গেলাম মা মৌলীক্ষার মন্দির।

শ্রী শ্রী মাতা মৌলীক্ষার মন্দির। ASI দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিচালিত। মৌলীক্ষা তারাপীঠের তারামায়ের সহোদরা ছিলেন বলে কথিত আছে। মৌলীক্ষা কথাটির উৎপত্তি দুটি শব্দ থেকে, মৌলী (মাথা) ও ইক্ষক্স (দৃশ্যমান)। মৌলাক্ষী মায়ের কোনো শরীর নেই, শুধু একটি লাল রঙের মাথা ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে তৈরি মন্দির গৃহের মেঝেতে শায়িত আছে। এখানে ভক্তরা পুজো দেয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিবমন্দির, একটি বামাখ্যাপার সাদা মূর্তি বসানো মন্দির ও আর একটি মন্দির আছে। এই প্রধান মন্দিরের আশেপাশে সমগ্র মুলুটি গ্রামে ১০৮টি শিবমন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এক মাইল এলাকা জুড়ে। বর্তমানে ৭২টি মন্দির অবশিষ্ট আছে। আমি কেবল ৪০টি মন্দিরই দেখতে পারলাম। শরীরে দিচ্ছিল না।

মুলুটি গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ১৫ শতকের গৌড়ের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। একবার গৌড়ের সুলতানের পোষা বাজপাখি হারিয়ে যায়। এই অঞ্চলের বসন্ত নামে এক যুবক সুলতানের সেই হারিয়ে যাওয়া পোষা বাজপাখিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিদান স্বরূপ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ মুলুটি গ্রাম বসন্তকে দান করেন। তখন থেকে সেই যুবক বসন্ত 'বাজ বসন্ত' নামে পরিচিত হন। বসন্তের উত্তরাধিকারীগণ পরে নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে নেয় এবং নিজ নিজ সাধ্যমতো গুচ্ছ গুচ্ছ মন্দির নির্মাণ করতে থাকে। এখন ৭২টি মন্দিরের অবশিষ্টাংশই দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলির গায়ে টেরাকোটার ছাঁচের কাজ রয়েছে। সেখানে রামায়ণের কাহিনীর বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে, রয়েছে দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী ও ছিন্নমস্তার মূর্তির চিত্রও।

আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বসবাস নেই বললেই চলে। তবে এখানে বাংলা ও হিন্দি যৌথ ভাষার মানুষ বসবাস করে। কার্তিক মাসের কালী পুজোর সময় বহু ভক্তের আগমন ঘটে। গ্রামের বসবাসকারী যারা কাজের জন্য বাইরে থাকে তারা ফিরে আসে এই সময় উৎসবের আনন্দ নিতে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই মাটির তবে টিনের চাল দেওয়া।

ফেরার পথে এক দোকান মালিক জিজ্ঞাসা করলেন আমি ফিরব কী করে? আমি বললাম, দেখি, কোনো বাইক আরোহী পাওয়া যায় কিনা। তখন তিনি এক পণ্য পরিবাহী ম্যাটাডোর ভ্যানের চালককে বললেন আমাকে হস্তিনাকাদাপুর পৌঁছে দিতে। সেখান থেকে এক চলমান বাইক আরোহীর পিছনে বসে মল্লারপুর স্টেশনে পৌঁছে ২-৪০ মিনিটে বামদেব লোকাল ধরে বর্ধমান। সেখান থেকে ব্যাণ্ডেল হয়ে হাওড়া। বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে ন-টা হয়ে গেল।

ইতিহাসের কোলে হারিয়ে যেতে বসা এই মৌলীক্ষার মন্দিরগুলি দেখলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

খবরে দুনিয়া

পশ্চিম পাকিস্তানে তালিবান আক্রমণে আহত মিডিয়ায় কলাম লেখা কিশোরী, মার্কিন দ্রোণ হামলা জারি

১২ অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তানে মার্কিন 'দ্রোণ' হামলায় নিহত ১৮, আহত ১৫। ইনসেটে, ৯ অক্টোবর তালিবান হামলায় আহত মালালা ইউসাফজাই।

কুশল বসু, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর •

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই লাগোয়া পশ্চিম পাকিস্তানে শান্তি চলে গেছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তান আগ্রাসন শুরু হতেই আফগানিস্তানের উপজাতি এলাকা থেকে তালিবানরা লাগোয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ২০০২ সালে পাকিস্তান সরকার এদের ওপর আক্রমণ চালাতে সেনা নামিয়ে দেয়। ২০০৪ সাল থেকে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র পাকিস্তান সরকার পুরোদস্তুর যুদ্ধে নেমে যায়। জনসমর্থন পেয়ে যায় সশস্ত্র মার্কিনবিরোধী শক্তিগুলি। সেখানকার বেশ কিছু সংগঠন মিলেমিশে ২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে তোলে পাকিস্তানের তালিবান শক্তি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, শরিয়তি আইন জারি এবং ইঙ্গ মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের ডাক দিয়ে। তাদের মূল কাজ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং তারও পশ্চিমের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। উল্লেখ্য, এই খাইবার পাখতুনখাওয়া ১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

অস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন জনসমর্থনের জোরে পাকিস্তানি তালিবানরা পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে অচিরেই। কিন্তু একইসাথে তাদের কার্যকলাপে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। একের পর এক স্কুল ধ্বংস করে দেয় তারা। স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। তালিবানদের দমন করতে সরাসরি নেমে পড়ে আমেরিকা। আফগানিস্তান যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে পাকিস্তানেও।

এই পরিস্থিতিতে পাখতুনখাওয়ার শান্তিকামী মানুষেরা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে যুদ্ধ এবং তালিবানদের জারি করা বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের এক অন্যতম নেতা, কবি এবং সোয়াত উপত্যকার একটি স্কুলের মালিক জিয়াউদ্দিনকে ব্রিটেনের বিবিসি সংবাদসংস্থা বলে, তার স্কুলের কোনো শিক্ষিকা তালিবান জমানায় পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে কিছু লিখতে আগ্রহী কি না। জিয়াউদ্দিন জানায়, তার মেয়ে লিখতে পারে, তার বয়স এগারো, নাম মালালা ইউসাফজাই। ততদিনে ওই এলাকায় মার্কিন সরকার মনুষ্যবিহীন বিমান 'দ্রোণ' দিয়ে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বিবিসি-তে 'গুল মকাই' ছদ্মনামে মালালা-র কলাম বেরোতে শুরু করে। পাখতুনখাওয়ার সোয়াত উপত্যকার স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং তালিবান-পাকিস্তানি সেনার লড়াই-ই ছিল তার মূল উপজীব্য। আগ্রাসী মার্কিন বাহিনীর এক রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুকের সাথে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে মোলাকাত হয় মালালা-র। মার্কিন কর্পোরেট মিডিয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস তাকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানায়। পাকিস্তানি টিভিতে নিয়মিত আসতে শুরু করে মালালা, তালিবান শক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের মেয়েদের শিক্ষার অধিকারের দাবি নিয়ে। ইউনিসেফ পরিচালিত একটি শিশু শিক্ষা বিষয়ক এনজিও-র এক গুরুত্বপূর্ণ পদে সে আসীন হয়। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে মালালা-কে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়, যার নাম আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার'। এই ঘটনা তাকে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত করে তোলে। পাকিস্তানেও সরকারের তরফে সে পুরস্কার পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠা মালালা পাক ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন ও তার মিত্র পাক সরকারের পক্ষ নিয়েছে, এমনই বার্তা চলে যায় বৃহত্তর পাক জনমানসে।

২০১২ সালে তালিবান নেতারা তাকে হত্যার হুমকি দেয়। মালালা তার ফেসবুক পাতায় লেখে, আমাকে মেরে ফেললেও আমি বলব, তোমরা যা করছ, তা ভুল। ৯ অক্টোবর এক বন্দুকধারী এক ঝাঁক স্কুল পোশাকের মেয়েদের মধ্যে থেকে 'কে মালালা' জিজ্ঞেস করে এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তিনজন মেয়েকে আহত করে। মাথায় বুলেট লেগে অচৈতন্য হয়ে পড়ে মালালা। আপাতত বেঁচে গেছে সে। কিন্তু তার বাবা ও তাকে ফের মেরে ফেলার চেষ্টা করা হবে, জানিয়েছে পাকিস্তানি তালিবান সংগঠনের মুখপাত্র। বাবা জানিয়েছে, আমরা পাকিস্তান ছাড়ছি না, সে মেয়ে বাঁচুক আর মরুক। আমরা আদর্শবাদী, শান্তিকামী। তালিবানরা দেশের সমস্ত স্বাধীন কন্ঠকে রুদ্ধ করে দিতে পারবে না।

উল্লেখ্য, এই সপ্তাহেই ১২ অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্কিন 'দ্রোণ' হামলায় ১৮ জন মারা গেছে এবং ১৫ জন আহত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থার শিরোনাম হয়নি। কিন্তু মালালা-র ওপর হামলার ঘটনা মার্কিন-ব্রিটিশ মিডিয়ার শিরোনামে রয়েছে প্রায় এক সপ্তাহের ওপর ধরে।

লোককবি গুরুদাস পালের জন্মশতবর্ষে মেটিয়াব্রুজ বদরতলায় স্মৃতিচারণ সভা

জিতেন নন্দী, ৭ অক্টোবর, ছবি ফারুক-উল-ইসলামের তোলা •

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মেটিয়াব্রুজ বদরতলার মালোপাড়ার ঘাটে গুরুদাস পালের স্মৃতিচারণার জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার উদ্যোক্তা ছিল 'মাটির কেল্লা'। তবে এতে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে 'বদরতলা মৎস্যজীবী কল্যাণ সমিতি'র সদস্যরা। সভায় অতিথির আসন গ্রহণ করেন গুরুদাস পালের ভাইঝি প্রভাবতী পাল, একসময়কার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মী গৌরী পাল এবং গুরুদাস পালের সঙ্গী যাত্রাশিল্পী গৌরমোহন দাস। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন গুরুদাস পালের ভাইপো, নাতি-নাতনিরা এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ।

মাটির কেল্লার পক্ষে বিশ্বজিৎ রায় সভার সূচনা করেন। প্রথমে দুটি গান পরিবেশন করেন গণশিল্পী প্রবীর বল, তার মধ্যে ছিল গুরুদাস পালের জনপ্রিয় রচনা 'থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরি পানা ... স্বভাব তো কখনো যাবে না' গানটি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গুরুদাস পালের আত্মজীবনী 'জীবন ও শিল্প' লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। সেটি উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র পাল। পুস্তিকাটি উপস্থিত সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আত্মজীবনীটি এই সভায় পাঠ করা হয়। এরপর শুরু হয় স্মৃতিচারণ।

যাঁরা গুরুদাস পালের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন। প্রভাবতী পাল নিজের কাকার কথা বলতে গিয়ে প্রায় কিছুই বলে উঠতে পারেন না। গৌরী পাল বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন এবং লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। গৌরমোহন দাস গান রচনায় গুরুদাস পালের প্রতিভার কথা স্মরণ করেন — 'দাদা রাস্তা দিয়ে যায়, দু-তিনখানা গান আমাকে শুনিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে পাঁচ-ছয়খানা গান গায়। আমি বললাম, দাদা কী করে গাইলে? দাদা বলল, ওই যে রাস্তা দিয়ে গুনগুন করছিলাম, ওই করতে করতে গান বেঁধে ফেলেছি ... কী জানি, গাইতে গাইতে মনে এসে যায়!' গুরুদাস পালের দুটি গান পরিবেশন করেন তাঁর ভাইপো অঞ্জন পাল, সঙ্গে ছিলেন মিতালী পাল, উষা অধিকারী এবং গোপীনাথ পাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র নাথ, অসিত রঞ্জন জোয়ারদার এবং ঋষিকেশ পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আনন্দ কিশোর পাল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণা সেন।

নিখিল রঞ্জন জোয়ারদার গুরুদাস পালের সাহচর্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আক্ষেপ করেন, 'গুরুদাসদাকে অনেক রাত পর্যন্ত কেনাবেচা করে রাতে দোকানেই থাকতে হত। শীতের রাত, ঠান্ডায় তাঁর ম্যানিনজাইটিস হয়ে গেল। এই দুঃসময়ে আমিও কি পেরেছি তাঁকে দেখতে যাতে তাঁর অসুবিধার নিরসন হয়? আমিও পারিনি। এই ব্যথা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে বা বর্তমানে যে সমস্ত মানুষ অপরের জন্য চিন্তা করেন, তাঁদের অবদান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' গঙ্গার তীরে বসে এই ছোট্ট স্মৃতিচারণ সভায় তাঁর এই বেদনাবোধ হয়তো অন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলা

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর •

২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা এবং চট্টগ্রামের পাটিয়া উপজেলার বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরগুলিতে ব্যাপক হামলা, বৌদ্ধ মূর্তি ও প্রতিমা ভাঙচুর, লুটপাট হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত রামুর বিভিন্ন বড়ুয়াপাড়া। এতে আগুনে ভস্মীভূত হয় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বাড়িঘর। রাত ১০টার পর থেকে রামু উপজেলার বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে একের পর এক এসব ঘটনা ঘটে এবং তা রবিবার ভোর ৪টা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই ঘটনার জের ধরে রবিবার সকাল ১১টায় পাটিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী একটি অংশ বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরে হামলা চালায়। এখানেও চলে ভাঙচুর ও লুটপাট। এছাড়া কক্সবাজার জেলার উখিয়াতেও বিক্ষুব্ধরা বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালায়।

রামু এলাকার এক ফেসবুক ব্যবহারকারী উত্তম কুমার বড়ুয়া পবিত্র কোরাণ শরিফের একটি আপত্তিকর ছবি শেয়ার করেছেন, এই খবরের থেকে শনিবার রাতে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা রামু স্টেশনে জমায়েত হয়ে মিছিল করে বড়ুয়াপাড়ার দিকে ধেয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটায়।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি জনজাতিদের ওপর অভিবাসী বাঙালিরা অত্যাচার চালাচ্ছে, এই অভিযোগ অনেকদিনের।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.